ভিনদেশ ও ভিন আচরণ
(২)

দিলরুবা শাহানা

নভেম্বরের সকাল। মিষ্টি ঝলমলে রোদ চারদিকে তবু শীত শীত ভাব। হতে পারে ক্রিকেট মাঠটি সমুদ্র পারের লাগোয়া তাই ঠান্ডা হাওয়া লাগছে। এখানে এখন গরমের শুরু আর একই সাথে পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেট ক্লাবগুলোও মেতে উঠেছে কোচিং আর ম্যাচ আয়োজনে। আমাদের ক্লাবের ১২র নীচের ছেলেরা মাত্র বোলিং শেষ করেছে। সবাই একটু চা বা কফির মাঝে উষ্ণতা খুঁজছে। এরপরই সমুদ্রপারের ক্লাব বোলিংএ নামবে। আমাদের ছেলেরা ভালই খেলেছে আজ।

আমি ক্লাবঘর থেকে গরম কফির কাপ নিয়ে যেই বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি বারান্দা থেকে আমার ছেলের গলা ভেসে এলো।
-হ্যাভ ইউ সীন শাহানা?
আমার চলার শক্তি থেমে গেল মনে হল। তাজ্জব লাগলো ওর কথা শুনে।ও কি ভূলে গেছে যে আমি ওর মা। নাকি আজকে দুই উইকেট আর এক মেইডেন পেয়ে প্রশংসার হাততালিতে মাথায় গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। নাকি ভাবছে আজকে থেকে যথেষ্ঠ লায়েক বনেছি তাই মাকে নাম ধরে ডাকলেই চলবে। সেকেন্ডেরও কনা সময়ে এতো ভয়ংকর ভাবনাচিন্তার অসাধারন ক্ষমতা স্রষ্টা মেয়েদেরই দিয়েছেন বোধহয়। এতো দুঃচিন্তার মাঝেও ধীর পায়ে দরজার দিকে এগুচ্ছি তখনি বারান্দায় চোখে পড়লো আমাদের ক্লাবের তুখোড় ব্যাট্সম্যান ছোটখাটো মিচেলকে। সাথে সাথে আমার ছেলের গলা
-মিচেল, হ্যাভ ইউ সীন মাই মম্?
সাথে সাথে দোয়া পড়ে বুকে ফুঁ দিলাম। যাক্ বাঁচা গেল আমার ছেলে ভুলেনি আমি যে ওর মা। মুখ গম্ভীর করে বললাম
-কিরে আদরে বাদর মাকে মা বলতে হয় এই ভদ্রতা ভূলে গেলি দেখলাম?
-আহ্ মামনি এই ক্লাবের সবাই জানে তুমি আমাদের ক্লাব থেকে স্কোর লিখতে এসেছ, নেইম ট্যাগেও তোমার নামই লিখা ঠিক না। ঐ ক্লাবের স্কোরার মহিলা তোমার নাম ধরে ডাকছে শুনেই আমি তোমাকে খুঁজতে আসলাম।
কিক্রেট পছন্দ করি সেই সখের তাগিদে ছেলের ক্লাবের সেক্রেটারী ক্যারোলাইনের উৎসাহে স্কোর লেখার প্রশিক্ষণও নিয়েছি, আনন্দ লাগে সবাই মিলে হৈ চৈ করে কখনও বাচ্চাদের উৎসাহ দিই বা কখনও স্কোর লিখি।
ওর ব্যাখ্যা শুনে মনটা শান্ত হল। আরেকবার ওর বন্ধুদের উপর বিরক্ত হয়েছিলাম। তখন ও বেশ ছোট। নীচের ক্লাসে পড়ে। ওর ইস্কুলের কি এক কমিটিতে আমিও ছিলাম। একদিন কমিটি মিটিং শেষ করে বের হচ্ছি মাঠ থেকে ওর ছোট্ট বন্ধুরা মহা উৎসাহে আমাকে ‘হাই শাহানা

হাই শাহানা' বলে গ্রীট করলো। ওরা যতোটা আনন্দিত হয়েছিল আমাকে দেখে আমি ঠিক ততোটাই দুঃখিত ওদের এই নাম ধরে ডাকাডাকিতে। আজব ওদের সংস্কৃতি, ছোটবড় কোন মান্যিগন্যি নাই। এই ছেলেদের মা'দের আমি চিনি, অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে বলা যায়। আর এরা কিনা মায়ের বয়সী মহিলাকে মহা আনন্দে গলা চড়িয়ে নাম ধরে ডাকছে। মহা বেয়াদব এরা। ছেলে স্কুল থেকে বাসায় ফিরলে বললাম

-বাবা তোমার বন্ধুদেরকে বলো বন্ধুর মাকে নাম ধরে ডাকতে নেই।

-ওরা ওদের সব বন্ধুর মাকেই নাম ধরে ডাকে

-ঠিক আছে, আমিতো ওদের মায়েদেরও বন্ধু আমাকে খালা-চাচী না হয় নাই ডাকলো আন্টিতো ডাকতে পারে ঠিক কথা কিনা বলতো? আচ্ছা তুমিতো আন্ট বারবারা, আন্ট ভ্যাল, আন্ট রুবী বলো, তাইনা?

-কি দরকার আমার ওদের আন্ট টান্ট ডাকার। আমিতো ওদের সাথে কথাই বলিনা।

বুঝলাম দুই সংস্কৃতির দুইরকম প্রত্যাশা। আন্ট ডাকলে আমি হব খুশী আর ওরা হয়তো হবে বিরক্ত। সবচেয়ে ভাল কথাই না বলা। দ্বন্ধ এরাতে কথা না বলা হচ্ছে সেরা উপায়।

ব্যারিস্টার সালমা সোবহান বলেছিলেন অন্যের সংস্কৃতির এই গুরুজনকে মান্যিগন্যির নিয়ম পালন করতে যেয়ে এক পশ্চিমা ছেলের ঢাকায় এসে কি দূরবস্তা হয়েছিল। ভাগ্যিশ সালমাআপা বিষয়টি বোঝাতে ছেলেটি কষ্ট থেকে রেহাই পায়। ছেলেটি খুব সম্ভব সালমাআপার বন্ধুর ছেলে বা ওঁর ছেলেদের বন্ধু। ঢাকায় বেড়াতে এসে ও সালমাআপার পরিবারের সাথে কিছুদিন থাকে। লম্বা ছেলে, তার পা দু'টোও লম্বা লম্বা। পরিবারের সবার সাথে যখন মেঝেতে বসে গল্পগুজব করতো বা ভিডিওতে সিনেমা দেখতো ও সবসময় পা দু'টি মূড়ে বসতো বা পা ভেঙ্গে দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে বসতো যাতে পা দু'টি বেয়াদবের লাঠির মতো সামনে ছড়িয়ে না পড়ে। দুইদিনের মাথায় সালমাআপা ওর কষ্ট আঁচ করে ওকে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসতে বলেন। বেচারা খুশীমনে পা ছড়িয়ে বসে সালমাআপাকে অনেক ধন্যবাদ জানালো। তারপর বলেছিল ওর মা ওকে সতর্ক করে দিয়েছিল যাতে এইদেশে বয়সে বড়দের সামনে পা ছড়িয়ে না বসে। পা ছড়িয়ে বসার পরও কিন্তু সালমাআপা ও রেহমানস্যারের(প্রফেসর রেহমান সোবহান) প্রতি ছেলেটির ভক্তিশ্রদ্ধায় কোন ভাটা পড়েনি।

এবার আরেকটি বিষয় বলছি। স্যু ও'ব্রায়েনএর সাথে এক চ্যারিটি সংস্থাতে পরিচয়। পোষাকেআশাকে সাদাসিদা স্যুর সবসময় পরিচর্যিত নখই শুধু বলে যে, যা খুশী তাতে খরচ করার মত অজস্র পয়সা ওর আছে। আমি স্যুকে আমাদের বাংলাদেশের জন্য আয়োজিত এক চ্যারিটি অনুষ্ঠানে আসার অনুরোধ করি, ও এক কথায় রাজী হয়ে যায়। ঐ সন্ধ্যায় সুজান ও'ব্রায়েন আর ওর স্বামী ফিল ও'ব্রায়েন দু'জনেই আসে। তখন ডিনারে ওদের সাথে অনেক গল্প হয়। ওরা দু'জনেই শিক্ষিত, রীতিমত ডিগ্রীর অধিকারী, নিজস্ব ব্যবসা আছে, তিন সন্তান ওদের। বড়ছেলে স্কুল শেষে তার প্রিয় পেশা মোটরমেটানিক(!) হওয়ার জন্য এ্যাপ্রেন্টিশিপ করছে, মেজছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, ছোট স্কুলে এখনও আছে।

-মোটরমেকানিক!

আমার বিস্মিত গলা শুনে স্যু বললো

-এনিথিং রং

শুধু 'রং' নয় আমার চোখে পুরো ব্যাপারটাই রংবেরং লাগলো। অবাক কান্ড মা-বাবা দু'জনেই শিক্ষিত, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাও রয়েছে; আর তাদের ছেলে উকিল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক না হয়ে হতে চাইছে গাড়ীর মিস্ত্রী। ফিল নরম গলায় তৃপ্তির হাসি নিয়ে বললো

-হি লভস্ গ্রীজ, হি লভস্ টু বি ডার্টি; উই আর প্রাউড অব হিম।

এখানে ওদের সাথে আমাদের তফাৎ। ওরা ঐ কাজকে গুরুত্ব দেয় যা করে সে আনন্দ পায়, সুখী বোধ করে। অন্যেরা যদি তার কাজের জন্য তাকে প্রশংসা করে গৌরব সে বোধ করবে অবশ্যই, তবে না করলেও কিছু যায় আসেনা। মানুষের ঐ কাজ বেছে নেওয়ার শর্তহীন স্বাধীনতা রয়েছে যে কাজে সে তার সর্বোচ্চ দক্ষতা ঢেলে দিতে পারে। আর আমরা আমাদের ভীরু হৃদয়ের ভিখারী পিপাসা মিটানোর জন্য মায়ের অনুমোদন চেয়ে কবির ভাষায় বলি 'মা যদি হও রাজী বড় হলে আমি হব খেয়াঘাটের মাঝি'।

একবার আমার এক আত্মীয়া দেশে যাচ্ছে। সকালের ফ্লাইট। আমি আমার বন্ধু বারবারাকে নিয়ে ওকে প্লেনে তুলে দিতে এসেছি। ঝামেলা বাধলো ওজন নিয়ে। কয়েক কেজি চকোলেট খুলে ফেলাতে ওজন ঠিক হল। আমি চকোলেটপিয়াসী না তাই বার্বারার ভাগ্যে সবটুকু চকোলেট জুটলো। সে বার্বারাকে বললো,

-চিন্তার কারণ নাই, ভিতরে ঢুকে ডিউটি ফ্রি শপ্ থেকে আবার একই চকোলেট সবগুলো কিনবো, তখনতো ওজন করবেনা আর?

-ডিউটী ফ্রি শপ থেকে চকোলেট!

বার্বারা আর্তনাদ করে উঠলো প্রায়। আমিও কিছুটা অবাক হলাম ওর প্রতিক্রিয়ায়। বেচারী দুঃখীত গলায় আমাকে বললো,

-ওকে বল ডিউটী ফ্রি শপে খুব ভাল মদ সস্তায় পাওয়া যায়, চকোলেট না, মদটা কিনলে বাড়ীতে সবাই খুশী হবে। কিছুদিন আগে আমার ভাই নিউজিল্যান্ড থেকে আসার সময় এই এয়ারপোর্ট থেকেই বেশ কমদাম দিয়ে দামী মদ এনেছিল; অনেকদিন পর অতো ভাল মদ খেলাম।

আমি ওকে ভেঙ্গেচুড়ে বলিনি যে মদের গুণ বিচারের মত সমঝদার মানুষ আমরা নই। অন্যের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে মদের তুচ্ছতা প্রমানে উঠে পড়ে লাগলাম না।